ইংরেজের রেখে যাওয়া কতিপয় কুপ্রথা

ভূমিকাঃ কেউ যদি কারো বাড়িতে এসে ময়লা-আবর্জনা ফেলে চলে যায়, তাহলে সে এ কাজ শত্রুতাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে করুক, কিংবা ভুলবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকুক না কেন, সেই আগন্তুক চলে যাওয়ার পর ঘরের মালিক ও সদস্যরা নিশ্চয়ই সেই সমস্ত আবর্জনাগুলো ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এমন এক জাতি, যারা বিদেশী ডাকাতদের ফেলে যাওয়া যতসব জঞ্জাল যত্নের সাথে লালন করে চলেছি। ইংরেজরা যে আমাদের কাছে বন্ধু হিসেবে আসেনি, তারা যে লুণ্ঠনকারী ও অত্যাচারী ছিল, এ বিষয়ে আমরা প্রায় সকলেই একমত। তাদের শোষণ ও নির্যাতনের কাহিনী আমরা পাঠ্যবইয়েও পড়ে থাকি। কিন্তু যেই ইংরেজদের আমরা ঘৃণা করি, সেই ইংরেজদের প্রবর্তিত ক্ষতিকর জিনিসগুলো কেন যে আমরা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করার পরিবর্তে শ্রদ্ধাভরে বুকে জড়িয়ে আছি, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। একটা জাতিকে নৈতিক ও জাগতিকভাবে পঙ্গু ও দেউলিয়া করার জন্য এমন কোন ব্যবস্থা নেই যা ইংরেজরা করেনি। যা কিছু আল্লাহর বিধান এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী কিংবা আমাদের জীবন ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর, বেছে বেছে ঐ সমস্ত জিনিসই আমাদের মাঝে চালু করে দিয়েছে। তারা সাধারণ মানুষের মাঝে যেমন অপসংস্কৃতি ও অনাচার ছড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি যাবতীয় সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, প্রশাসন, আর্মি, পুলিশ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের জাল বিছিয়ে দিয়েছে। আমাদের নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলী ধ্বংস করে আমাদেরকে শিকড়হীন ও মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত করার জন্য তারা যেসব হাজারো রকমের ফাঁদ পেতে রেখে গেছে, সেসবের মধ্যে কয়েকটি এখানে আমরা আলোচনা করব।

পতিতাবৃত্তিঃ ইংরেজরা এ প্রথা চালু করেছে এ যুক্তিতে যে, এ থেকে সরকারী কোষাগারে অর্থ সমাগম হয়। অথচ বৃটিশরা আসার আগে আমাদের বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাকাত গ্রহণের মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। যারা আমাদের যাবতীয় সম্পদ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব করে দিয়েছে, তারাই কিনা আমাদের অর্থ উপার্জনের জন্য এমন অভিনব এক বীভৎস পন্থা বাতলে দিয়ে গেছে, আর আমরা তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গাধার মত বয়ে বেড়াচ্ছি। পতিতাবৃত্তি থেকে কি আমাদের জাতীয় সম্পদের কোন বৃদ্ধি হয়? এক্ষেত্রে তো দেশের যুবকরাই তাদের টাকা পতিতাদের দেয় এবং সরকার সেই পতিতাদের কাছ থেকে সেই টাকার অংশ লাভ করে। মাঝখান থেকে মানুষের চরিত্রই হারাতে হয়। যে যুবকরা পতিতাদের পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করে তারা সেসব অর্থ কিভাবে উপার্জন করে? সরকারী অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হলে তো যুবকরা যেখান থেকে অর্থ উপার্জন করে সেখান থেকেই ট্যাক্স আদায় করা যেত। আর যুবকরা যদি পতিতালয়ে গমনের জন্য চুরি-ডাকাতি করে অর্থ আদায় করে থাকে সেক্ষেত্রেও তো তারা দেশের মানুষের সম্পদই লুণ্ঠন করে। এর চেয়ে যদি সেই যুবকদের বিপথগামী হবার পথ রুদ্ধ করা যেত তাহলে দেশের মানুষের অর্থ-সম্পদ লুট হওয়া থেকে বেঁচে যেত এবং তা থেকেই সরকার কর আদায় করতে পারত। অতএব, এই জঘন্য কুপ্রথা ইংরেজরা উদ্ভাবন করেছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাবার জন্য নয়, বরং নৈতিক অবনতি ঘটাবার জন্য। পতিতালয়ের দ্বারা হয়ত যুবকদের চিত্তবিনোদন ও মেয়েদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যুবকরা যদি টাকাগুলো মেয়েদেরকে পতিতা হিসেবে ভোগ করার কাজে ব্যবহার না করে বিয়ে করে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণে ব্যয় করত, তাহলে কি যুবকদের বিনোদন ও মেয়েদের জীবিকার ব্যবস্থা হতো না? আল কুরআনে বলা হয়েছে, "শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারাঃ২৬৮) অতএব, দারিদ্র ও অভাব থেকে বাঁচার জন্য শয়তানের নির্দেশিত পথ গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহর নির্দেশিত পথ গ্রহণ করলেই আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী অধিক সচ্ছলতার গ্যারান্টি পাওয়া যাবে।

সুদঃ ইংরেজরা সুদপ্রথা এমন ব্যাপকভাবে চালু করেছে যে, তার কুপ্রভাব আপামর জনসাধারণকেই আচ্ছাদন করেছে। এর দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের অর্থ কিছু সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে জালেম ও শোষকদের সম্পদের পাহাড় বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু দেশের সম্পদ কিছুমাত্র বাড়ে না। ইংরেজরা যেসব সুদখোর মহাজন প্রতিষ্ঠা করেছিল তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে আজ সেই ইংরেজেরই মদদপুষ্ট এনজিওরা। আর ব্যাংকের সুদ ইংরেজরা যেভাবে চালু করেছিল সেভাবেই যথারীতি বহাল আছে। মোটকথা, জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জন কিংবা সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা না রাখলেও মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদকে হারামের দ্বারা কলুষিত করার ক্ষেত্রে এ সুদ অসামান্য অবদান রেখেছে।

মদঃ ইংরেজরা মদের লাইসেন্স চালু করে আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার পূরণের এক সস্তা ব্যবস্থা দিয়ে গেলেও এর দ্বারা যুব সমাজের কর্মশক্তি বিনষ্ট হয়ে কার্যত জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতিই সাধিত হচ্ছে, যা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

পোস্ট মর্টেম ও ফরেনসিক টেস্টঃ ইংরেজরা হত্যাকারী ও ধর্ষণকারীদের অপরাধ প্রমাণের নামে নিহতদের দেহ কাঁটাছেড়া আর ধর্ষিতাদের দেহ পরীক্ষার এক অভিনব রীতি চালু করে গেছে। অথচ তারাই আমাদের দেশবাসীর মানবিক মূল্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ দূর করে স্বার্থপরতা ও হিংসা-বিদ্বেষের বীজ ঢুকিয়েছে, যার ফলে মানুষ মানুষকে খুন করার প্রবণতা গড়ে ওঠে। আর অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে যুবকদের লাম্পট্যবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে নারী ধর্ষণের মত অপরাধের ক্ষেত্র প্রস্তুত

করেছে। আবার তারাই কিনা অপরাধীদের শাস্তিদানের মাধ্যমে অপরাধ দূর করার নামে অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করার আইন করে গেছে। অথচ খুনী ও ধর্ষকদের শাস্তি দেয়ার জন্য তারা তেমন কোন আইন ও বিচার ব্যবস্থা উপহার দিয়ে যায়নি। বরং বিচার প্রক্রিয়াকে কিভাবে জটিল ও দীর্ঘায়িত করা যায় এবং প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের কাজকে কত কঠিন ও দুরূহ করে রাখা যায়, সে ব্যবস্থাই মূলত পাকাপাকি করে গেছে। তাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থার ফলাফল দাড়াল এই, হত্যাকারীর গায়ে কোন আঁচড় পড়বে না, কেবল নিহত ব্যক্তিকেই কাঁটাছেড়া করা হবে। অনুরূপভাবে ধর্ষণকারীকে কোনপ্রকার অসম্মান ও বেইজ্জতির সম্মুখীন হতে হবে না, কেবল ধর্ষিতারাই লাঞ্ছনা ও দুর্গতির শিকার হবে। এ ব্যবস্থায় নিহত ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বার হত্যা করা হয় এবং ধর্ষিতাকে দ্বিতীয় বার ধর্ষণ করা হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণের সামনে যেসব হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়, অপরাধীরা যেখানে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, সেসব ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি দিলেই তো দেশ থেকে হত্যা ও ধর্ষণের সংস্কৃতি বহুলাংশে দূর হয়ে যাবার কথা। প্রকাশ্য অপরাধের ঘটনার বিচার করার ন্যায় প্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়ে নিহত ও ধর্ষিতদের দেহ নিয়ে খেলা করার অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকা কতটা যুক্তিযুক্ত? তদুপরি শত শত মানুষের সামনে যারা খুন বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হয়, যাদের মৃত্যুর কারণ এমনিতেই একশ ভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়, তাদের লাশ নিয়ে কাটাকাটি করার ন্যায় অর্বাচীনতা আর কি হতে পারে? অনেক সময় লাশ কাঁটাছেড়ার ভয়ে নিহত ব্যক্তির আপনজনেরা মামলা করার পরিবর্তে খুনীদের সাথে আপোষ করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে ধর্ষিতারাও ডাক্তারী পরীক্ষা থেকে বাঁচার জন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পরিবর্তে ঘটনা চেপে রাখাকেই শ্রেয় মনে করে।

সামরিক বাহিনীতে অবাঞ্ছিত নিয়মনীতিঃ ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের দেশের লোকদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করেছিল। কিন্তু তাদের মাথায় এ খেয়ালও বর্তমান ছিল যে, তারা চলে যাবার পর তাদেরই দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্যরা যেন তাদের আদর্শ বাদ দিয়ে ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠতে না পারে, সেনাবাহিনী যেন ইসলামের পাহারাদার হয়ে না যায়। এজন্য তারা ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন তথা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য সেনাবাহিনীতে প্রবেশকে যতটা সম্ভব কঠিন ও দুরূহ করে গেছে, আর পাশাপাশি এমন ব্যবস্থা করেছে যে, যাতে ধার্মিক কেউ আর্মিতে ঢুকতে গেলেও ধর্মীয় মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়েই ঢুকতে হয়, ঈমানী চেতনা নিয়ে যেন কেউ সামরিক বাহিনীতে ঢুকতে না পারে। আমরা ইতিহাসে পড়েছি, বৃটিশ সরকারের অধীনস্ত মুসলিম সিপাহীদের শুয়োরের চর্বি মাখানো কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। কিন্তু এর চাইতেও মারাত্মক ও ভয়ানক ব্যবস্থা তারা চালু করেছে যা আজ অবধি বর্তমান আছে। সেনাবাহিনীতে যোগ্যতা যাচাই কিংবা দক্ষতা, সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ানোর নামে অনেক অনৈসলামিক ও অরুচিকর অভিনব কুপ্রথা প্রচলিত আছে। এসব অপ্রীতিকর বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে সিলেকশনের সময় চেকআপের নামে বিবস্ত্র করে দেখা এবং প্রশিক্ষণের সময় কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ানোর নামে নোংরা পানিতে নামানো আর সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি খেতে বাধ্য করা। এ ধরনের বিশ্রী, কুরুচিপূর্ণ ও অপ্রীতিকর আচার-আচরণ মুসলমান কেন, কোন স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রুচিশীল মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর ইসলাম তো কোন অবস্থাতেই এ ধরনের নগ্নতা ও নোংরামিকে অনুমোদন করে না। আমরা জানি, লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতা ঈমানের সর্বাধিক অপরিহার্য দুটি অঙ্গ। যারা এসব কুপ্রথা চালু করে গেছে, তারা যে আমাদের ঈমানকে কলুষিত করবার উদ্দেশ্যেই এগুলো করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের জানা উচিত, একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে ঈমান ও নৈতিকতা। যুদ্ধজয়সহ যেকোন কাজে বিজয় ও সফলতার জন্য সামরিক শক্তি, উপায়-উপকরণ ও দৈহিক বলের তুলনায় নৈতিক শক্তিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ইসলামী জিহাদের ক্ষেত্রে ঈমানী চেতনা ও আল্লাহর সাহায্যই সবচাইতে অপরিহার্য শর্ত। নিছক দৈহিক শক্তিই যদি বিজয়ের মাপকাঠি হতো, তাহলে জন্তু জানোয়াররাই মানুষের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করত। কোন ঈমানদার মানুষ যাতে শক্তি অর্জন করতে না পারে এবং কোন শক্তিশালী মানুষ যাতে ঈমানদার থাকতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যই ইংরেজরা এসব ঘৃণ্য ফাঁদ পেতে রেখে গেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ কিংবা জিহাদের লক্ষ্য হল মানব সমাজ থেকে যাবতীয় জুলুম, অন্যায় ও অনাচারের মূলোৎপাটন করা। এখন যদি সেই যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে নিজেদের মাঝেই এসবের চর্চা করা হয়, তাহলে তা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরুপায় অবস্থায় সীমিত পরিমাণ হারাম ভক্ষণের অনুমতি যদিও ইসলামে আছে, কিন্তু তাই বলে সম্ভাব্য দুরবস্থার জন্য আগে থেকেই সবাই মিলে হারাম ভক্ষণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, এমন দৃষ্টিভঙ্গি অর্বাচীনতারই নামান্তর। পৃথিবীর যেকোন স্থানে সাপ-কেঁচো অপেক্ষা ঘাস, লতাপাতা আর গাছ-গাছড়াই যে অধিক available, একথা কে না জানে? ইন্দোনেশিয়ায় সেনাবাহিনীতে সাপের রক্ত পান করা হয় সাপের কামড় সহ্য করার ক্ষমতা অর্জনের নামে। কিন্তু আমরা জানি, যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি যেটা ফেস করতে হয় সেটা হল গুলী-বোমার আঘাত। তবে কি এখন সেই গুলী বোমার আঘাত হজম করার জন্যও প্রাকটিকাল পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, “হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে-- যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়।” (সূরা আরাফ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “কোন পুরুষ যেন কোন পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করে এবং কোন নারী যেন কোন নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করে।” আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি যে, শয়তান আমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে নির্লজ্জতার আদেশ দেয়, আর আল্লাহ আমাদের প্রাচুর্যদানের অঙ্গীকার করেন। তাহলে সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে এটাই বলা যায় যে, শয়তান আমাদেরকে যুদ্ধে পরাজয়ের ভয় দেখায়। অর্থাৎ, শয়তান আমাদেরকে বোঝাতে চায় যে, শরীর পুরোপুরি পরীক্ষা করে না নিলে শারীরিক সমস্যার কারণে

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটতে পারে, একজন সৈনিক শারীরিকভাবে অক্ষম হলে তার পিছনে ব্যয় করা সরকারী অর্থ বৃথা যাবে ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যদি শয়তানের কর্মনীতি পরিহার করে আল্লাহর বিধান মোতাবেক নিজেদের সামরিক নীতিকে ঢেলে সাজাতে পারি, সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের পদ্ধতি থেকে শুরু করে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও রণকৌশল পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকে বজায় রাখি, তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহেই আমরা সাফল্য ও বিজয় লাভে সক্ষম হব। ইংরেজরা আমাদের জন্য যেসব লজ্জাজনক ও অবমাননাকর ব্যবস্থা করেছে তার উদ্দেশ্য শারীরিক যোগ্যতা ও সহ্যক্ষমতা কিংবা মানসিক সাহস ও আনুগত্য পরীক্ষা করা নয়, বরং নির্লজ্জতা ও নোংরামি পরীক্ষা করা, যাতে তাদেরকে যেকোন নির্লজ্জ ও নোংরা কাজে বাধ্য করা যায়। অর্থাৎ, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সামনে বিবস্ত্র হয়ে লজ্জাকে বিসর্জন দিতে কিংবা নর্দমায় ঝাঁপ দিয়ে পবিত্রতা জলাঞ্জলি দিতে বা সাপের মাংস খেয়ে হালাল-হারামের বিধানকে অগ্রাহ্য করতে রাজি হয় কিনা সেটা পরীক্ষা করা। কিন্তু আমরা তাদের মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিংবা ডিসিপ্লিন শিক্ষা মনে করে ওসব আজব ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছি।

উপসংহারঃ পরিশেষে বলা যায় যে, আমরা শত্রুর রেখে যাওয়া জঞ্জাল থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হতে পারব এবং নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে সবকিছু গড়ে তুলতে পারব, জাতির জন্য ততই মঙ্গল। সামরিক-বেসামরিক, সরকারী-বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে পরাধীন দেশের গোলামী উপযোগী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য। বেসামরিক ক্ষেত্রে সরাসরি সরকারী ক্ষমতার প্রয়োগ করে সংস্কার সাধন করতে হবে। আর সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়া সাপেক্ষে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিলিটারী একাডেমীতে প্রচলিত যাবতীয় সিলেবাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইসলামী আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন বিষয় কোথাও থাকলে তা পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া দেশের প্রতিরক্ষার জন্য উপযোগী লোক তৈরির ক্ষেত্রে জবরদস্তি অপেক্ষা মোটিভেশনকেই অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামের সোনালী দিনগুলোর ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামের সৈনিকেরা স্বেচ্ছায় স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরকে তাদের শাসকেরা পায়ে শিকল বেঁধে যুদ্ধের ময়দানে থাকতে বাধ্য করে। জয় কাদের হয়েছিল সকলেই জানেন। তবে তাই বলে সৈনিকদেরকে ননীর পুতুল বানিয়ে রাখতেও ইসলাম বলে না। শারীরিক যোগ্যতা যাচাই এবং কষ্টসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির পদ্ধতি ইসলামেও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সৈন্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় কুস্তি লড়ানোর মাধ্যমে শক্তির পরীক্ষা নিয়েছেন। জালূতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাবার পূর্বে তালূত তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ যেন নদী থেকে পানি পান না করে। অতএব, পবিত্রতা, শালীনতা আর মানবিকতাকে বজায় রেখেই আমাদের সেনাবাহিনীর সিলেকশন আর প্রশিক্ষণের কাজ সম্পন্ন হতে হবে।